চম্‌স্কি, ব্যাকরণ ও বাংলা বানান

পবিত্র সরকার

প্রমা

ভূমিকা

ভাষাতত্ত্বের নানা দিক নিয়ে লেখা প্রবন্ধ অনেক জমে গিয়েছিল, সেগুলোকে দুই মলাটের মধ্যে আনার কাজটি সম্পন্ন হল শ্রীমান সন্দীপ নায়কের প্ররোচনায়। এতে প্রবন্ধগুলোকে কয়েকটি ভাগে সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

এক দলে আছে, নিছক পড়াশোনা করে কিছু লেখা, মূলত বাঙালি পাঠকদের জানানোর জন্যে; সেগুলোতে মৌলিকতার কোনো দাবি নেই। আর-এক দলে আছে অল্প-স্বল্প গবেষণা করে লেখা কিছু প্রবন্ধ, সম্ভবত বাংলা ভাষায় প্রথম প্রয়াস। তৃতীয় একটি দলে আছে ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত দু-একটি লেখা। চতুর্থ দল, সমাজ ও ভাষার সম্পর্ক নিয়ে। পঞ্চম দলে আছে বেশ কিছুদিন আগে ঘুলিয়ে তোলা বানান ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রবল বিতর্কের প্রতিক্রিয়া, বিতর্কেরই আকারে, কিন্তু তাতে তথ্য ও যুক্তি নিজের মতো করে সাজানো।

বাংলায় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখার কিছুটা চাহিদা হয়েছে বলে মনে হয়। সে চাহিদা শুধু পাঠ্য বইয়ের নয়। হয়তো নানামুখী জিজ্ঞাসুদের কাছে এ বই কিছুটা গ্রহণযোগ্য হবে।

অন্যান্য বইয়ের মতো এ বইয়েও সহধর্মিণী মৈত্রেয়ীর প্রুফ দেখা ও অন্যান্য মূল্যবান সহায়তা পেয়েছি।

জানুয়ারি ২০১৩ পবিত্র সরকার

সূচিপত্র

সাধারণ খবরাখবর	.....	০৯-১৪২
কথা বলা, কথা শোনা	.....	১১
ব্যাকরণ মানে কী	.....	২৫
খাঁটি বাংলা ব্যাকরণের বিন্যাস কী হবে	.....	৬০
নোয়াম চম্‌স্কি ও তাঁর ভাষাতত্ত্ব	.....	৭৪
সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব	.....	৯০
অভিধানের সীমা ও সম্ভাবনা	.....	১১২
উপভাষা–চর্চার ভূমিকা	.....	১৩২
কিছু গবেষণা	.....	১৪৩-২৫৮
'কি' বনাম 'কী'	.....	১৪৫
পুথিপাঠ ও লিপিবিজ্ঞান	.....	১৫২
'মানে, মানে ... ইয়ে' ইত্যাদি	.....	১৬৩
বদকথার সেই বিশেষ দল	.....	১৭৩
বুলি-মিশ্রণ, বুলি-লম্ফন	.....	১৮৪
বাংলা সাধু গদ্যের আদর্শায়ন	.....	২০৪
পরিভাষা-প্রসঙ্গ ও রবীন্দ্র-পরিভাষা	.....	২২৮
নামতত্ত্ব ও নামকরণের সেকাল-একাল	.....	২৪১

ভাষা শিক্ষা ২৫৯-২৯২

অন্য ভাষা শেখা : নানা প্রসঙ্গ ২৬১

হিন্দি-উর্দুর উচ্চারণ ২৭৮

সমাজ ও ভাষা ২৯৩-৩৪২

ভাষাবিরোধ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২৯৫

গণশক্তির গোলটেবিল ৩০৯

'মাতৃভাষা' ও শিক্ষা : আর একবার ৩২২

জাতপাতের ভাষা, ভাষার জাতপাত ৩৩২

বিতর্ক-সমাচার ৩৪৩-৩৭৮

বাংলা বানান-সংস্কার : শেষ প্রতিবেদন ৩৪৫

কথা বলা, কথা শোনা

১. বলা ও শোনা : অনেকগুলি কাজ

একজন কথা বলছে, আরেকজন শুনছে—এই সামান্য ঘটনাটা আমরা কি আদৌ লক্ষ করি? কে কী বলছে সেইটে শোনবার জন্য বেশি ব্যস্ত থাকি, কিন্তু ওই বলতে ও শুনতে গিয়ে কে কী 'করছে' তা ঠিক খেয়াল করি না। খেয়াল করি না আরও এই কারণে যে, এই বলা ও শোনা বলতে যে 'কাজ' গুলি বোঝায়, তার সবগুলি আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কিছু 'কাজ' হয় মস্তিষ্কে—যা আমাদের দেখার ক্ষমতাই নেই; কিছু 'কাজ' হয় গলায় আর মুখে, সেগুলি নানা চেষ্টাচরিত্র করে দেখে নিতে হয়; কিছু 'কাজ' হয় বাতাসে, তাও সাদা চোখে ধরা পড়ে না; কিছু কাজ হয় কানের ভিতরে, তাও সাদা চোখে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। আবার কিছু কাজ শেষমেষে হয় ওই মস্তিষ্কেই, সেটাও দেখে ফেলার কোনো রাস্তা নেই।

তবে বলা ও শোনার পুরো বৃত্তটাকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, একটা অংশ সক্রিয় বা 'অ্যাকটিভ'; আর একটা অংশ, শোনার অংশটা-ঠিক আক্ষরিকভাবে না হলেও বিশেষ অর্থে অক্রিয় বা 'প্যাসিভ'। আমরা অনেকেই জানি যে, আমাদের মস্তিষ্কে সাধারণভাবে দু-ধরনের স্নায়ু আছে : অনুভবের (Sensory nerves) আর নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চালনের স্নায়ু (motor nerves); বলা চলে গ্রাহক স্নায়ু আর চালক স্নায়ু। চালক স্নায়ু আমাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে মস্তিষ্কের নির্দেশ মেনে সঞ্চালন করে। অর্থাৎ আমাদের হাত-পা থেকে জিভ বা আঙুলের ডগা যা-ই আমরা নাড়াই, সবই ওই চালক স্নায়ুর নির্দেশে ও সক্রিয়তায়। এখন, কথা বলার সময় ওই চালক স্নায়ুগুলি যতটা সক্রিয় থাকে, কথা শোনার সময় গ্রাহক স্নায়ুই সক্রিয় থাকে, চালক স্নায়ু ততটা সক্রিয় থাকে না। ফলে কথা বলা একটা 'অ্যাকটিভ' প্রক্রিয়া, কথা শোনা কমবেশি 'প্যাসিভ'। অবশ্য গোরু-ঘোড়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা কোনো একটা আওয়াজ শুনলে আক্ষরিকভাবেই 'কান খাড়া' করে। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাদের চালক স্নায়ুগুলিও কিছুটা সক্রিয়তা দেখায়।

এই কথা বলা থেকে কথা শোনা পর্যন্ত কটা ধাপ বা পর্যায় আছে? আমাদের কাছে বলা ও শোনা একটা ব্যবধানহীন প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া— কথা বলা হল, সেই মুহূর্তেই শুনেও ফেললাম আমরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুঝেও ফেললাম। এর মধ্যে আবার পর্যায় কীসের? কিন্তু ধ্বনিবিজ্ঞানীরা বলা ও শোনার পুরো বৃত্তটিকে কয়েকটি পরম্পরায় ভাগ করেন। তাঁরা দেখান যে, মস্তিষ্কে (বা 'মনে') কথা বলার ইচ্ছে জেগে ওঠা থেকে কথা বলে ফেলা, এবং শ্রোতার সেটা শুনে ফেলা পর্যন্ত কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া চলে— সেগুলির শৃঙ্খল দিয়েই বলা ও শোনার ওই বৃত্তটি তৈরি হয়। আমরা ধ্বনিবিজ্ঞানী ক্যাটফোর্ডের বিশ্লেষণ অনুসরণ করে এই পরম্পরাটি দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করছি এই নিবন্ধে। শেষে ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ও 'কনারের দেওয়া একটি নকশার সঙ্গে এই পরম্পরা মিলিয়ে দেখবার সুযোগ হবে।

২. মস্তিষ্কের কাজকর্ম

কথা বলা মানুষের ভাবপ্রকাশের একমাত্র উপায় নয়। কোনো কিছু সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা ও আবেগ প্রকাশ করার একাধিক রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তা হল কথা বলে ওঠা। এটাই সবচেয়ে বড়ো রাস্তা। আমরা যখন কথা বলার উদ্যোগ নিই, তখন থেকেই আমাদের মস্তিষ্কের কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। ক্যাটফোর্ড এই পর্যায়ের নাম দিয়েছেন 'নিউরোলিঙ্গুইস্টিক প্রোগ্রামিং'।

কথা উঠবে, মস্তিষ্কের কোন্ জায়গাতে এই প্রোগ্রামিং হয়, কোত্থেকে প্রথম হুকুমটা আসে? অর্থাৎ আমাদের বলা বা শোনাকে নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের কোন্ বিশেষ অংশ? 'বলা'-কে 'শোনা' থেকে আলাদা করে দেখতে হবে, কারণ দুয়ের ইন্দ্রিয় আলাদা, ফলে স্নায়ুসংযোগও পৃথক। আমাদের মস্তিষ্কের দু গোলার্ধে আলাদাভাবে প্রত্যেকটি কাজের জন্য এইরকম দুদিকে ছড়ানো জোড়াজোড়া স্নায়ু-উৎস আছে। ঘ্রাণের ইন্দ্রিয় আলাদা, ফলে স্নায়ুসংযোগও পৃথক। মাথার দুপাশে দুটি কান আছে, সুতরাং মস্তিষ্কের দুভাগে (অর্থাৎ দুই হেমিস্ফিয়ার বা গোলার্ধেই) তার স্নায়ুসংযোগ আছে, তা ভাবাই যেতে পারে। ঘ্রাণের দুটি স্নায়ুকেন্দ্র, দেখার জন্য দুটি, চোখের নড়াচড়া গতিবিধির জন্য গুটি তিনেক চালক-স্নায়ু ইত্যাদি। আগেই বলেছি, শোনার কাজে গ্রাহক স্নায়ুগুলির ভূমিকাই বড়ো, কথা বলায় চালক স্নায়ুর ভূমিকা বেশি।

বলার স্নায়ুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের কোন্ অংশ? কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গা, একটা স্পষ্ট 'কন্ট্রোল রুম' কি আছে মস্তিষ্কে— যেখান থেকে শুধু কথা বলার ব্যাপারটি পরিচালনা করা হয়? কিছুদিন আগে পর্যন্ত শারীরবিজ্ঞানীরা খানিকটা

নিশ্চিত সুরে বলতে পারতেন 'হ্যাঁ, ওইরকম একটা জায়গা আছে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কের বাঁ-গোলার্ধে।' এটা তো অনেকেই জানেন যে, আমাদের শরীরকে যদি খাড়া দু'টো সমানভাবে ভাগ করে দেখা যায়, তার ডানদিকটাকে চালায় মস্তিষ্কের বাঁদিককার অংশ, আর বাঁদিকটাকে চালায় মস্তিষ্কের ডানদিককার গোলার্ধ। শরীরের পরিচালনার কাজকর্ম এইভাবে পার্শ্বিত বা 'lateralised' হয়ে যায়।

এদিকে আমাদের শরীরের ডানদিকটা একটু প্রাধান্যও পায়। আমরা ডান হাত দিয়েই বেশি কাজ করি, ডান হাত, ডান পায়েই জোর বেশি পাই, ফলে নিশ্চয়ই মস্তিষ্কের বাঁ-গোলার্ধই অধিকাংশের ক্ষেত্রে (ন্যাটা' বা 'বাঁইয়া'-দের ক্ষেত্রে ছাড়া) বেশি সমর্থ ও কার্যকর। কথা বলার মূল পরিচালক ওই বাঁ-গোলার্ধ— এ-অনুমান আরও প্রবল হয়েছে যখন দেখা গেছে যে, বাঁদিকের মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে শরীরের ডানদিকটা যেমন অসাড় হয়ে যায়, তেমনি কথা বলার ক্ষমতাও ব্যাহত হয়। শরীরের ডানদিকের প্যারালিসিস হলে কথা জড়িয়ে যায়, কিন্তু বাঁদিকের পক্ষাঘাতে তা হয় না। অর্থাৎ 'ডমিন্যান্ট হেমিস্ফিয়ার' বা মস্তিষ্কের প্রবলতর গোলার্ধেই হয়তো কথা বলার মূল কেন্দ্রটি তৈরি হয়—এই অনুমান এক সময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেকের ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের বাঁ-গোলার্ধই প্রবলতর, ফলে তাতে, বিশেষত তার সামনের 'লোব্'-গুলিতে, আরও নির্দিষ্টভাবে 'ব্রোকা-র অঞ্চল' (Broca's Area) নামক অংশে আমাদের কথা বলার মূল কন্ট্রোল-রুম অবস্থিত, এমন অনুমান করা হয়েছিল।

এখন কিন্তু বিজ্ঞানীরা অত নিশ্চিত নন। এখনও এ-বিষয়ে সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত কিছু হয়নি, তবে তাঁদের ধারণা, মস্তিষ্কের মধ্যে কথা বলার নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র একাধিক

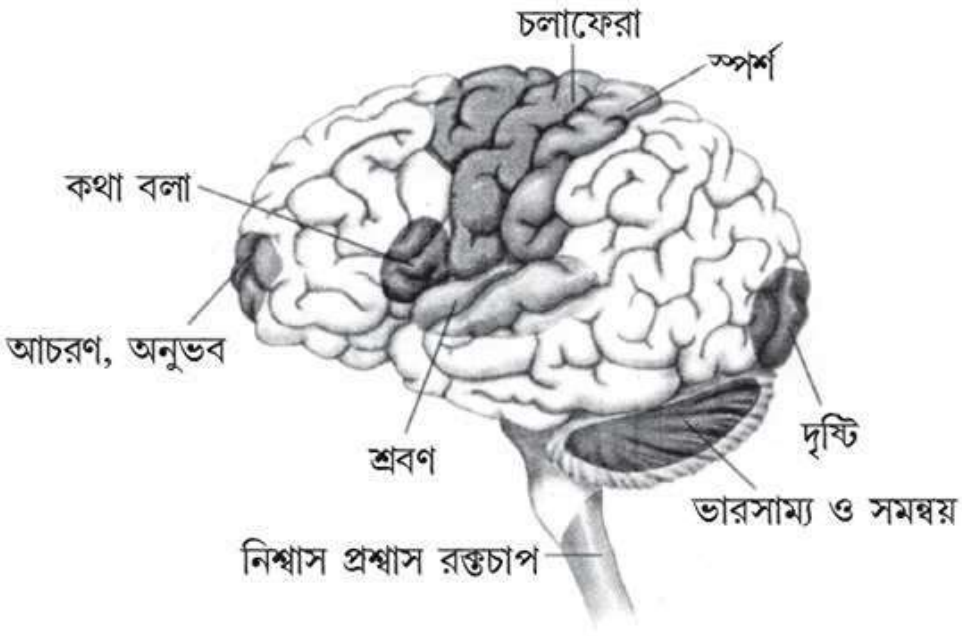

জায়গায় ছড়িয়ে থাকা সম্ভব। মোটরগাড়ির ড্রাইভার যেমন একটা রাস্তায় গণ্ডগোল দেখলে অন্য রাস্তা দিয়েও তার গন্তব্য জায়গায় পৌঁছোতে পারে, কথা বলার বিষয়টিও তেমনই। এই এলাকাটাই এখনও খুব অস্পষ্ট, এবং ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, এদিকে গবেষণার প্রচুর সুযোগ আছে, সম্ভাবনাও প্রচুর। কিন্তু এই 'ন্যারো লোকালাইজেশন থিয়োরি' বা ভাষাকেন্দ্র মস্তিষ্কের একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এই মতবাদ লেনেবার্গ প্রমুখ শরীরভাষা- বিজ্ঞানীরা প্রমাণসহ নয় বলে পরিত্যাগ করেছেন। বরং 'নন-লোকাল স্টোরেজ' বিষয়েই বিশ্বাসটা বাড়ছে।

কিন্তু কথা বলার ইচ্ছে হলে প্রথম তোড়জোড় তো মস্তিষ্কই শুরু করে। সেটা কীভাবে করে? এ-বিষয়ে জন লেভার-এর একটি পরম্পরার হিসেব আছে। তাঁর মতে, অন্তত এই অংশটুকু (অর্থাৎ ক্যাটফোর্ডের এই 'নিউরোলিঙ্গুইস্টিক প্রোগ্রামিং') তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত : ভাবনা (ideation), সঞ্চয় (storage) এবং পরিকল্পনা (programme planning)। লেভার ক্যাটফোর্ডের আগেই (১৯৭০) এই পরম্পরা তৈরি করেছিলেন, এখানে আমরা ক্যাটফোর্ডের পর্যায়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তাঁর পর্যায়গুলি অনুধাবন করছি।

লেভার বলছেন এবং আমরাও অনুমান করতে পারি, ভাবনা বা 'আইডিয়েশন'-অর্থাৎ কথা বলবার প্রথম উদ্যোগটা সম্বন্ধে স্পষ্ট করে জানা খুবই কঠিন। তার সঙ্গে ভাষাজ্ঞান, লেভার যাকে বলেন 'স্টোরেজ' বা সঞ্চয় ও বাক্‌পরিকল্পনার (তাঁর 'প্রোগ্রাম-প্ল্যানিং') কী সম্পর্ক, তাও বিশেষ জানা সম্ভব হয়নি।

'সঞ্চয়' অংশে ধরে নেওয়া যেতে পারে ভাষার যাবতীয় উপাদান ও নিয়ম সাজানো থাকে। ইদানীংকালে mental lexian বা মানসিক অভিধান কথাটা এই সঞ্চয় বোঝাতে চালু হয়েছে। ওই ভাষার ধ্বনি ও তার বিন্যাস, শব্দ এবং শব্দগঠনের নিয়ম, বাক্যগঠনের নিয়ম অর্থাৎ বাক্যে শব্দসাজানোর নিয়ম, এক-এক জায়গায় এক-এক শব্দের অর্থগত প্রয়োগযোগ্যতা ('শোনা'-র অংশে এ-বিষয়ে আলোচনা দেখুন)—অর্থাৎ অর্থের নিয়ম— সবই মস্তিষ্কে সঞ্চিত আছে। ভাষা শেখা মানেই হল এইসব উপাদান ও সে-সংক্রান্ত নিয়মের একটি ভাণ্ডার মস্তিষ্কে গড়ে তোলা। ঠিক কোথায়, কীভাবে এই ভান্ডারের অবস্থান, মস্তিষ্কের 'নিউরন'গুলির সঙ্গে কোন্ ধরনের উপাদান বা নিয়মের কী সম্পর্ক—সে-সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা এখনও পরিষ্কার নয়।

কিন্তু এই ভাণ্ডারের জিনিসগুলি কীভাবে সাজানো আছে, সে-সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা হয়েছে। এ-সঞ্চয় স্মৃতির সঞ্চয়। এ থেকে কথা বলার সময় শব্দ বা

বাক্য কীভাবে তুলে আনি আমরা? লেভারের ওই 'প্রোগ্রাম-প্ল্যানিং'স্তরেই এটা করা হয়ে থাকে। এ-সম্বন্ধে ধারণা এখনও খুব স্পষ্ট নয়। তবে একটি সম্ভাব্য অনুমান এই যে, মস্তিষ্ক পুরো বাক্য বলার জন্যই প্রস্তুতি নেয়, আলাদা আলাদাভাবে একটার পর একটা ধ্বনি সাজিয়ে প্রথমে শব্দ (word) এবং পরে শব্দ সাজিয়ে বাক্য তৈরি করে না। শব্দ অবশ্যই বাছাই করতে হয় বাক্যের জন্য, কিন্তু এই বাছাই চলে অর্থের ভিত্তিতে। লেভার অনুমান করেন, একই অর্থের এবং ব্যবহারের (function)-এর এক ধরনের শব্দ এক জায়গায় সাজানো থাকে। এর প্রমাণ বাক্য বলতে গিয়ে কখনও ভুল করে একই অর্থের দু-দুটো শব্দ আমরা ব্যবহার করে ফেলি, যেমন He acted as like a fool। কিংবা least বলব না slightest ব্যবহার করব, তা ঠিক করতে না পেরে দুটো গুলিয়ে 'জোড়কলম' শব্দ ব্যবহার করি— It did not bother me the sleast। আর 'এক চাপ কা' ধরনের বাক্য থেকে বুঝতে পারি, মস্তিষ্ক পুরো বাক্যটাই বলবার জন্য তৈরি হয়েছে, বাক্যের শেষ শব্দ ('চা')-ও সে বলতে গেছে, কিন্তু জিভ হড়বড় করে হুকুম পালন করতে গিয়ে 'চা' -এর 'চ' আগে এনে 'কাপ'-এর 'ক' পরে নিয়ে গেছে।

যাই হোক, মস্তিষ্কের কন্ট্রোল-রুমে কী বলা হবে তা ঠিক হল। এবার সে উচ্চারণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়গুলিকে, কথাটা বলে ফেলার জন্য হুকুম পাঠাবে। এই হুকুম মেনে বাগিন্দ্রিয়গুলি বাক্যটিকে উচ্চারণ (articulate) করবে। এই উচ্চারণ বা articulation হল লেভারের মতে কথা বলার পরবর্তী পর্যায়। মস্তিষ্ক পিছন থেকে পুতুল-নাচিয়ের মতো কলকাঠি নাড়ছে অবশ্যই, কিন্তু এখানেই আমরা প্রথম খানিকটা চোখে, খানিকটা যন্ত্রের সাহায্যে কথা বলার প্রক্রিয়াটাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

৩. ধ্বনন (Phonation) অংশ : কথার উচ্চারণ

আমরা যখন কথা বলি, তখন একটু খেয়াল করলে আমরা টের পাই যে, মুখের মধ্যে নানারকম কাজকর্ম চলছে। গলা দিয়ে আওয়াজ হচ্ছে, আর সেই আওয়াজ গলনালি (ফ্যারিংক্স্) আর মুখগহ্বরে বা কখনও নাকের মধ্যে রণন (রেজোনান্স) তুলছে এবং জিভ ও ঠোঁট নানাভাবে সেই আওয়াজকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

গোড়া থেকেই শুরু করি। গলার আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে? সেটা আসছে 'কণ্ঠমূল' ('গ্লটিস') থেকে। বাইরে থেকে কারো গলার দিকে তাকালে গলা যেখানে মুখটাকে ধরে রেখেছে, তারই কাছাকাছি আমরা একটা তিনকোণা মতন উঁচু